# সন্ধ্যারাগ

সোমেশ্বর আমার হাত থেকে দুধপাঁউরুটির বাটিটা নিয়ে অস্ফুটস্বরে বললো, “এগারোটা নাগাদ যাবো বলেছি, অলরেডি সাড়ে ন’টা হয়ে গেছে।”

বললাম, “ঠিক আছে, আমরা না হয় আধঘণ্টাটেক লেটেই পৌঁছবো। কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে শুনি? বুড়োবুড়ি কোন রাজকাজে বেরুবে যে সাত তাড়াতাড়ি না ধরতে পারলে মিস্ হয়ে যাবে। সারাদিন বাড়িতেই তো বসে থাকে ওরা।”

“বসে কিংবা শুয়ে। শারীরিক অবস্থা কিরকম তাতো আমরা জানিনা।”

“তবে বয়েসটা আন্দাজ করা যায়। নিতু বলছিল গৌতমের গ্র্যাণ্ড পেরেণ্টস্। নিতুই তো ছাব্বিশ বছরের হয়ে গেল। গৌতমের বয়সও কাছাকাছি নিশ্চয়ই। আরও দু’টো জেনারেশনের ধরো পঁচিশ পঁচিশ পঞ্চাশ। তাহলে পঁচাত্তর থেকে আশি তো বটেই।”

“আহা, এই বুড়োবয়েসে একা একা পড়ে রয়েছে দু’টিতে। গৌতমের বাবা, কাকা, জ্যাঠা কেউই কি নেই?”

“এরকম তো হামেশাই শোনা যায় আজকাল। ছোট ছোট ছঞ্চক্ষংসষ্ট পরিবার, যে যার সে তার। পাখা গজালেই পাখীপাখালী নীড় ছেড়ে উড়ে যায়। পিছনপানে ফিরেও দেখেনা আর ----।”

সোমেশ্বর দুধপাঁউরুটির মণ্ড খানিকটা খেয়ে বাটিটা ঠেলে সরিয়ে দিলো। বাঁধানো দাঁতের পাটিজোড়া সুবিধে মতন হয়নি মোটেই। খাওয়াদাওয়া মাথায় উঠেছে। গলাপাক তরল খিচুড়ি - দালিয়া, মুখে দিয়েই কঁৎ করে গিলে ফেলা কোনমতে ---- গত দশদিন যাবৎ এই পথ্য চলছে এবং নতুন দন্তকৌমুদি ধাতস্থ না হওয়া তক এভাবেই চালিয়ে যেতে হবে আপাতত। আমার নিজের অবস্থাও কিছু আহামরি নয়।

বছরের এই সময়টা বাতের ব্যথা উত্তুঙ্গে ওঠে। Pain-killer আর মালিশের জোরে খাড়া আছি। এর উপর স্পণ্ডিলাইটিস, অম্বল, ফিক-ধরা, আধ-কপালে ইত্যাকার অন্যান্য উপসর্গগুলো তো আছেই। শরীরং ব্যাধিমন্দিরং। একই অঙ্গে এত রোগ প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় এসে। বুড়োহাবড়া হলে না জানি কি দশা হবে।

নিতু বলে দিয়েছে ফোনে অগ্রিম খবর দিয়ে তবে যেন যাই। আসলে নড়বড়ে বুড়োবুড়ি, হয়তো কানে শোনেনা, চোখে দেখেনা ঠিকমত। দরজা এঁটে পড়ে থাকে। আগে থেকে খবর না দিলে ভয় পেয়ে হয়তো দরজাই খুলবে না। যা দিনকাল পড়েছে ! সোমেশ্বর তাই কদিন আগে ফোন করেছিল। আজ সকাল এগারোটা নাগাদ আমাদের যেতে বলেছে ওরা। নিতুর অফিসের এক কর্মচারী কার্যোপলক্ষে দিল্লী এসেছিল। তার হাত দিয়ে ছেলে আমার গুচ্ছের টুকিটাকি জিনিস পাঠিয়েছে বাপ-মা'র জন্যে। সেইসঙ্গে একখানা জবরদস্ত বইয়ের প্যাকেট। সেটা তার বন্ধু গৌতম তার গ্র্যাণ্ডপেরেণ্টস্‌দের পাঠিয়েছে। অফিসের কর্মচারীর হাতে সময় অল্প। আমাদের ফ্ল্যাটের অবস্থানটা তার কাছে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক বলে মনে হওয়ায় সেখানেই নামিয়ে দিয়ে গেছে সব। বইগুলো যথাস্থানে পৌঁছনোর দায় এখন আমাদের।

পৌঁছতে পৌঁছতে পৌনে বারোটা হয়ে গেল। দক্ষিণ দিল্লির সাজানো গোছানো একটা পাড়া। সারি সারি অট্টালিকা। নম্বর গুনে গুনে এগোচ্ছি দু'জনে। সোমেশ্বর আগে আগে চলেছে আর আমি বাতাক্রান্ত হাঁটু নিয়ে অনুসরণ করছি বেশ খানিকটা ফারাক রেখে। অবশেষে খুঁজে পেলাম। দরজায় সংক্ষিপ্ত ফলকে দুটি নাম - অবিনাশ পাণ্ডে, সুখলতা পাণ্ডে। একতলার ফ্ল্যাট দেখে মনটা প্রসন্ন হল। তা না হলে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে নাজেহাল অবস্থা হত। বেল টেপার বেশ কিছুক্ষণ পর দরজা খুললো। না, ওঁরা নন, কাজের লোক দরজা খুলে দিলো। মাঝ বয়সী স্ত্রীলোক। গাছকোমর করে শাড়ি পরা, দুই হাত কনুই অবধি ভিজে। কাপড় কাচছিল সম্ভবত। পরিচয় জানিয়ে ভিতরে খবর দিতে বললাম। স্ত্রীলোকটি দরজা থেকে একটু সরে গিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকতে ইঙ্গিত করলো এবং আমরা প্রবেশ করামাত্র দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে দিলো।

হাত নেড়ে সোফার দিকে দেখিয়ে বললো, "আপনাদের বসতে বলে গেছেন।"

"বলে গেছেন মানে? ওঁরা কি বাড়িতে নেই নাকি?"

"হাসপাতালে গেছেন। আপনাদের বসতে বলেছেন।"

স্ত্রীলোকটিকে প্রশ্ন করে এর বেশী কিছু জানা গেল না। ঠিকে ঝি, পাঁচ বাড়ি কাজ করে। আমাদের বসিয়ে তড়িঘড়ি অন্দর মহলে প্রস্থান করলো এবং দড়াদ্দম কাপড় পেটানোর শব্দে বোঝা গেল সে তার করণীয় কর্তব্যগুলো সেরে নিচ্ছে।

সোমেশ্বর গলা নামিয়ে বললো, "তেমন সিরিয়াস কিছু নয় নিশ্চয়ই। মামুলি কোনও অসুখ হবে কিংবা হয়তো প্রেশার টেশার চেক করাতে গেছে।"

বললাম, "এঁদের বয়সে মামুলি অসুখ বিসুখই মারাত্মক রকম সিরিয়াস হয়ে উঠতে সময় লাগে না।"

"জানি। আমি শুধু বলছিলাম যে থম্বোসিস অথবা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট জাতীয় কোনও ইমার্জেন্সি নয়, এই আর কি ----।"

বাহুল্যতাবর্জিত ছিমছাম ঘর। সাদাসিধে অথচ আরামজনক খানকয়েক চেয়ার। বুককেস ঠাঁসা বই। রাইটিং টেবিলের উপর একগোছা কাগজ ও একটা অদ্ভুত ধরনের টাইপরাইটার। সোমেশ্বর ঘাড় উঁচু করে দেখলো খানিকক্ষণ।

তারপর আড়ষ্ট গলায় বললো,"ব্রেল ----।"

"ওমা সেকি? ভদ্রলোক তার মানে অন্ধ?"

"ভদ্রলোক কিংবা ভদ্রমিহলা।" এই অচেনা বৃদ্ধ দম্পতির দুর্ভাগ্যের বিষাদে মনটা ভার হয়ে রইলো। রোগ - জরা - মৃত্যু এতো প্রকৃতির বিধান ! অথচ এর অনিবার্যতার কথা কত সহজে ভুলে যায় মানুষ। যুধিষ্ঠিরকে এই প্রশ্নই করেছিল জলাশয়ের দানবটা।

দরজার বেল বাজলো। স্ত্রীলোকটি বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দিলো।

অল্পবয়সী সুশ্রী একটি মহিলা ঘরে ঢুকে আমাদের নমস্কার করে বললো, "আমি ইরা, ইরা চিটনিস। উপরের ফ্ল্যাটে থাকি।"

তারপর কাজের লোকটিকে উদ্দেশ করে বললো, "হ্যাঁরে লছমি, এঁরা এসেছেন আমায় খবর দিস নি কেন? আণ্টি তোকে বলে যায়নি যে এঁরা এলে আমায় ডেকে দিতে? যা, শীগগীর চায়ের জল বসাগে যা।"

লছমির ততক্ষণে কাজ শেষ হয়ে গেছে। চায়ের জল চড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। ইরা চিটনিস চা বানিয়ে আনলো। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট আর চানাচুর। আর নারকোলের নাড়ু। সোমেশ্বর চা ছাড়া আর কিছু নিলো না। দাঁতের কষ্ট। চায়ে ভিজিয়ে বিস্কুট অবশ্য খেতে পারে কিন্তু বাইরের লোকের সামনে সেটা ভাল দেখায় না।

ইরা চিটনিস বললো, "দাঁড়ান, আণ্টি গাজরের হালুয়া বানিয়েছিল। ফ্রিজে আছে। গরম করে আনছি।"

বললাম, "গরম করতে হবে না। ঠাণ্ডাই চলবে।"

ভারী মিষ্টি হাসি খুশি মেয়েটি। অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে, যেন কতকালের চেনা। বললো, "হাসপাতাল যাবার সময় অনেক করে বলে গেছেন আপনাদের দেখাশোনা করতে। গৌতমের বন্ধুর বাবা-মা আসছে, কত আহ্লাদ ওঁদের। অথচ থাকতে পারলেন না।"

"কি হয়েছিল? হঠাৎ অসুখ বিসুখ কিছু?"

"না-না, ওঁদের কিছু হয়নি। বিজলির পোলে কাজ করতে গিয়ে একটা ছোকরা মিস্ত্রি মই থেকে পড়ে যায়। তাকেই হাসপাতালে নিয়ে গেছেন ওঁরা। ভর্তি টর্তি করে সব ব্যবস্থা করে দিয়ে তারপর আসবেন। বারোয়ারী হাসপাতালে গরীব দুঃখী মানুষকে তো পুছবেই না কেউ। বড় কেউ গিয়ে দাঁড়ালে তবেই ঠিকমত কাজ হয়। এ পাড়ায় এঁরাই সব ব্যাপারে এগিয়ে আসেন। কত লোককে যে বিপদে আপদে সাহায্য করেছেন তার লেখাজোকা নেই।"

"আপনাদের সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয় নিশ্চয়ই?"

"আসলে আমরাও ওঁদের কাছে উপকৃত বলতে পারেন। আমার ছেলে ভল্টু আঙ্কলের কাছে মাঝে মাঝে অঙ্ক বুঝতে আসতো। ভল্টুর অঙ্কের টিউটর ছিল কিন্তু ভল্টুর আঙ্কলের কাছে অঙ্ক শিখতে বেশী ভাল লাগে। বলে মাষ্টারমশাই জানে না। মাষ্টারমশাই নিজেই নাকি ওকে বাছা বাছা অঙ্ক দিয়ে বলে তোমার আঙ্কলকে দিয়ে করিয়ে এনো, মাষ্টারকে তার অন্য উঁচু ক্লাশের স্টুডেণ্টদের যে সব অঙ্ক শেখাতে

হয়। শেষ অবধি টিউটরকে বিদায় করে আঙ্কলের কাছেই সঁপে দিয়েছি ছেলেকে। অবশ্য একটা অসুবিধা ছিল। ওঁকে তো আর মাইনে দেওয়া যাবে না। শেষটা আণ্টি উপায় বাতলে দিলেন। আমি ওঁদের স্কুলে যোগ দিলাম। সপ্তাহে দুদিন সোশাল স্টাডি পড়াই।"

"ওঁদের আবার স্কুলও আছে নাকি?"

"ওঁদের গ্যারেজটায় রোজ সন্ধ্যেবেলা তিন চার ঘণ্টা ধরে ক্লাশ বসে। এলাকার যত দুঃস্থ পরিবারের ছেলেমেয়েরা যাদের গরীব খেটে খাওয়া বাপমা'র বিদ্যে-বুদ্ধি-সামর্থ্য নেই, তারা ওখানে বসে স্কুলের হোম ওয়ার্ক করে, দুরূহ অবোধ্য পাঠ বুঝে নেয়। এই support টুকুর জোরে তারা লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারছে। নইলে অধিকাংশেরই drop out এর খাতায় নাম উঠতো। এছাড়া আঙ্কল সদৃশমনাঃ কয়েকজনকে নিয়ে একটা নাগরিক সহায়তা কেন্দ্র খুলেছেন। জিনিসপত্রের কেনাকাটা-মেইনটেন্যান্স-সারভিসিং, জল-টেলিফোন-ইলেক্ট্রিসিটি বিল, ট্যাক্সি-অটোরিক্সার মিটার এবং ইত্যাকার যে কোনও ব্যাপারে নাস্তানাবুদ হলে ওঁদের শরণ নেয় লোকে। ওঁরা লেগে পড়ে সবরকম ঠগবাজি, জোচ্চুরি, অন্যায়ের প্রতিকার করেন। আণ্টি ফি রবিবার ব্লাইণ্ডস্কুলে গিয়ে বইপত্তর বিলি করে আসেন। বহু পরিশ্রম করে রাত জেগে ব্রেলে টাইপ করে নিয়ে যান সে সব।"

"ওঁদের শরীর স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই খুব ভাল?"

"শরীর স্বাস্থ্য খুব একটা ভাল নয়। আশির উপর বয়স। আধি-ব্যাধির কমতি নেই। আণ্টি ডায়াবিটিক, হাইপার টেনসনও আছে। আঙ্কল হাঁপানিতে ভোগেন। সদাসর্বদা inhaler নিয়ে ঘোরেন। অসুখ বিসুখ কনট্রোলে রাখার জন্য যা কিছু করনীয় তা সবই করেন কিন্তু তার বেশী আর অহেতুক প্রাধান্য দেন না অসুখ বিসুখকে। অন্যদের থেকে এঁদের পার্থক্যটা সেখানেই। সুস্থ সবল জোয়ান বয়সের লোকেরা যেখানে লাভ ক্ষতি, ভূত ভবিষ্যৎ, ঝুঁকি ঝঞ্ঝাটের চুলচেরা বিচার বিবেচনা করতে বসে যায়, এই দুই অশক্ত মানুষ নিঃশঙ্কচিত্তে নির্দ্বিধায় এগিয়ে আসেন। মনের দিক থেকে এঁদের কোনও অক্ষমতা, কোনও সীমাবদ্ধতা নেই।"

ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করে দু'টো নাগাদ বিদায় নিলাম আমরা।

ইরা চিটনিস বললো, "কে জানে হাসপাতালে হয়তো ঝামেলা

করছে। সবরকম ব্যবস্থা না করে ওঁরা ফিরবেন না। চিনি তো!”

বেরুবার মুখে রাইটিং টেবিলটার কাছে এসে সোমেশ্বর একটুক্ষণ থামলো। টেবিল থেকে পেপারওয়েটটা তুলে নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে আমার হাতে দিলো। দেখলাম সাধারণ একটা কাঁচের পেপার ওয়েটের উপর কাগজ চিপকানো। তাতে ছাপার হরফে লেখা রয়েছে :- It is how we live that is important, not how we die.

অবিনাশ পাণ্ডে ও সুখলতা পাণ্ডের সঙ্গে মুখোমুখি আলাপের সৌভাগ্য আমার কোনদিন হয়নি। তবু ওঁরা আমাকে নিবিড় ভাবে স্পর্শ করেছিলেন। কোনমতে টিকে থাকাটাই যে জীবন নয়, জীবন মানে বাঁচার মত বাঁচা, এই মূল্যবান সত্যের উপলব্ধি ওঁদের কাছ থেকেই পেয়েছি। এর পরের ঘটনাগুলো খবরের কাগজ পড়ে ও লোকমুখে শুনে যা জেনেছি সেইমত লিপিবদ্ধ করলাম।

হাসপাতালে যাবার সময় স্বভাবতই ট্যাক্সি নিতে হয়েছিল। ফেরবার পথে অবিনাশ পাণ্ডে ও সুখলতা পাণ্ডে একটা চার্টার্ড বাসে উঠলেন। চার্টার্ড বাসে ভিড় কম। দিব্যি বসে যেতে পারবেন। ট্যাক্সি ভাড়ার টাকাটা বাঁচবে। পিছনের সীটগুলো একেবারে খালি। খানিক বাদে শুয়েই পড়লেন অবিনাশ পাণ্ডে। ব্যাগ থেকে ইনহেলারটা বার করে মুখের কাছে ধরলেন একবার। সুখলতা পাশের সীটে বসে উৎসুক চোখে স্বামীকে দেখলেন, মুখে কিছু বললেন না। বাসটা অন্ধেরিয়া মোড় অবধি যাবে। সেখান থেকে আধ কিলোমিটার হাঁটলে ওঁদের ফ্ল্যাট। তেমন বুঝলে মোড় থেকে একটা রিক্সাই নিয়ে নেবেন বরং ----।

বাসে সর্বসাকুল্যে জনকুড়ি লোক হবে। বেলা চারটে বেজেছে। এ সময়টা রাস্তাঘাটে ভিড় কম। পাঁচটার পর অফিস ফেরতা লোকের ভিড়ে তিলার্ধ ঠাঁই থাকবে না কোথাও। চার্টার্ড বাসেও তখন বসার জায়গা মেলা ভার। পরের স্টপে একদল ছোকরা উঠলো। জীনস্ ও টি-শার্ট পরনে, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ, চোখে কালো চশমা। পাশাপাশি ক'টা সীট দখল করে বসলো। জানলার কাঁচে মাথাটা ঠেকিয়ে চোখ বুঁজেছিলেন সুখলতা। মাত্র কয়েক মিনিট। বুঝি ঘুমিয়েই পড়েছিলেন। দুপুরে খাওয়া হয়নি, গত ক'ঘণ্টা ধরে দারুণ ঝক্কিঝামেলা গেছে। তিনটে হাসপাতাল

ঘুরে তবেই ভর্তি করতে পেরেছেন ছেলেটিকে। তাও অনেক কলকাঠি নেড়ে, বহু হম্বি তম্বি করে ----।

অবিনাশ কি যেন বলছেন। শরীরটা বেশী খারাপ হল না তো? সুখলতা স্বামীর মুখের উপর ঝুঁকে পড়লেন। অবিনাশ চোখের কটাক্ষ দিয়ে বাসের সামনের দিকে ইশারা করলেন। ব্যাগ থেকে সেলফোনটা বার করে চট করে ওঁর মাথার কাছে সীটের ছেঁড়া অংশটার মধ্যে চালান করে দিলেন সেটা। তারপর বেশ জোরে জোরে inhaler থেকে শ্বাস নিতে থাকলেন চোখমুখ বিকৃত করে। সুখলতা অবাক হয়ে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আর সুযোগ পেলেন না। কালো চশমা পরা ছেলেগুলো সীটের লাইন ধরে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে যাত্রিদের মনিব্যাগ রিস্টওয়াচ গয়নাগাটি অবলীলাক্রমে ছিনিয়ে নিচ্ছে। ওঁর সামনে এসে দাঁড়াতেই সুখলতা তাড়াতাড়ি নিজের ঘড়িটা খুলে দিলেন। অবিনাশের ঘড়িটাও। ছেলেটি হাত বাড়িয়ে ওঁর কোল থেকে হ্যাণ্ডব্যাগটা ছোঁ মেরে তুলে নিলো। অবিনাশ কাশির তাড়নায় চোখমুখ লাল করে inhaler'টা মুখের সামনে ধরে আছেন। অন্য হাত দিয়ে নিজের পোর্টফোলিও ব্যাগটা এদিকপানে ঠেলে দিলেন। ছেলেটা ব্যাগ নিয়ে সরে গেল।

বাস তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে। ছোকরাদলের মধ্যে মাতব্বর গোছের দু'জন ড্রাইভারের পাশে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছে তাকে। ---- অবিনাশ নিঃঝুম হয়ে শুয়ে আছেন। সুখলতা সেই সীটেরই একপ্রান্তে এসে বসেছেন। স্বামীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। শাড়ির আঁচল দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন অসুস্থ স্বামীর মুখখানা। যাত্রিরা চিত্রার্পিতের মত বসে আছে। তাদের সবার কাছ থেকে লুণ্ঠিত টাকাকড়ি, ঘড়ি-আংটি, হার-দুল, চুড়ি-কঙ্কনে বোঝাই ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে তাদের দিকে নজর রাখছে একজন। দলের আর দুটো ছোকরা পাশে দাঁড়িয়ে ঠাট্টা মস্করা করে চলেছে সমানে। রাস্তায় যানবাহনের ভিড় বেড়ে গেছে। তাদেরই মাঝ দিয়ে পথ কেটে এগিয়ে যাচ্ছে হাইজ্যাক করা চার্টার্ড বাস, কারো মনে কোন সন্দেহমাত্রের উদ্রেক না করে। নিজেদের দুঃসাহসিকতার দম্ভে উঠতি বয়সের দুর্বৃত্তগুলোর উল্লাসের আর শেষ নেই। সমস্ত রাগ, দুঃখ, অপমান মনের মধ্যে চেপে রেখে যাত্রিরা তাদের অশালীন ভাঁড়ামি শুনে যাচ্ছে আর এই বাস-যাত্রার দুঃস্বপ্নের কখন ও কিভাবে পরিসমাপ্তি হবে তারই প্রতীক্ষা করছে।

বাসটা ততক্ষণে কুতুবমিনার ছাড়িয়ে লধাসরাইয়ের কাছাকাছি এসে গেছে। হঠাৎ অদূরে পুলিসের জীপ দেখা গেল। উল্টোদিক থেকে আসছে। দু'টো জীপ। সশস্ত্র পুলিসে ভরা। ছোকরাগুলোর টনক নড়লো। দু'জন এগিয়ে গেল সবথেকে পিছনের বেঞ্চটার দিকে। ধাক্কা মেরে সুখলতাকে বাসের মেঝের উপর ফেলে দিয়ে হ্যাঁচকা টানে অবিনাশকে তুলে দাঁড় করালো ---- "শালা হারামজাদা, বউয়ের আঁচলে মুখ ঢেকে পুলিসকে ফোন করা হচ্ছে তখন থেকে। বল্ ব্যাটা, বল্! কে তোদের বাঁচাবে এখন?"

পুলিস দেখে যাত্রিদের মনে সাহসের সঞ্চার হয়েছে ততক্ষণে। সবাই একজোটে প্রহাররত দুর্বৃত্তগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। পুলিস গুলি মেরে বাসের টায়ার ফাটিয়ে বাস থামালো। তারপর গুণ্ডাগুলোকে পাকড়ে জীপে চালান দিলো থানায়।

যাত্রার শেষ পর্যায়ে গুণ্ডাগুলোর সঙ্গে মোকাবেলায় যাত্রিদের মধ্যে কেউ কেউ আহত হয়েছিল। তাদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হল। অ্যাম্বুলেন্স ডেকে পাণ্ডে দম্পতিকেও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা পথিমধ্যে মারা যান। দুজনেই।